প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

সাহিত্য অপসাহিত্য পণ্যসাহিত্য

ভগীরথ মিশ্র

এই দুনিয়ায় সবকিছুরই একটা আসল-নকল ব্যাপার আছে। দেহ ও ছায়ার মধ্যে যেমন দেহ আসল, ছায়া নকল, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে যেমন জাগরণটা আসল, স্বপ্নটা নকল, ঠিক তেমনই, এই দুনিয়ায় সবকিছুরই একটা নকল রয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরোপুরি নকল হয়তো নয়, তবে দুধে জল মেশানো গোছের ব্যাপার তো হরবখতই থাকে। আবার, কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুধের সঙ্গে এতটাই জল মেশানো হয় যে, মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগে যায়, একে জলমেশানো দুধ বলব, নাকি দুধমেশানো জল! বোঝাই যাচ্ছে, এটা ঠিক আসল দুধের নকল বা ছায়া নয়, একটুখানি আসলের সঙ্গে অনেকখানি নকল। একে আমরা বলি ভেজাল, যা আজ কেবল বস্তুতেই নয়, আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবহারিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবলভাবে উপস্থিত। এবং সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই ভেজাল বস্তুগুলি যে আমাদের কী নিদারুণ ক্ষতি করে চলেছে, তা আর ব্যাখ্যা করে বলবার দরকারই নেই। এ ব্যাপারে আমরা সবাই ভুক্তভোগী। কাজেই, ক্রিমিকে বিষ্ঠার স্বাদ বোঝানোটা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমার মতে, মারণক্ষমতার নিরিখে অন্তত তিনটি ভেজাল বোধ করি সবচেয়ে ক্ষতিকর। ওষুধে ভেজাল, টাকায় ভেজাল, আর সাহিত্যে ভেজাল। ওষুধে ভেজাল থাকলে তা আমাদের মৃত্যু ডেকে আনে, টাকায় ভেজাল থাকলে তা আমাদের পুরো অর্থনীতিটাকেই ধ্বসিয়ে দেয়, আর, সাহিত্যে ভেজাল থাকলে তা আমাদের মানসলোকটিকে একেবারে পঙ্গু, বিকৃত করে তোলে। মানবজীবনে সেটা বোধ করি মৃত্যুর চেয়েও বড় ক্ষতি।

প্রথম দুটো ভেজাল সম্পর্কে আমাদের সবাইয়ের স্পষ্ট ধারণা থাকলেও, শেষোক্ত ভেজালটি সম্পর্কে অনেকের মনেই কোনও সম্যক ধারণা নেই। তাঁরা স্বভাবতই প্রশ্ন তুলবেন, সাহিত্যের আবার ভেজাল কি? ভেজাল সাহিত্য বলে কিছু হয় নাকি? অনেকে আবার সাহিত্যের ভেজালটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরা প্রায়শই অপসাহিত্য, পণ্যসাহিত্য ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে আসল সাহিত্যের সঙ্গে ভেজাল-সাহিত্যটির পার্থক্য বোঝান। আমরা হরবখত শব্দগুলো শুনি। কিন্তু একটুখানি চেপে ধরলেই বোঝা যায়, ওই ব্যাপারে অনেকেরই কোনও সম্যক ধারণা নেই। যেসব সাহিত্যে খুব রগরগে, চমচমে ব্যাপার রয়েছে, যৌনতার বাড়াবাড়ি রয়েছে, অনেকেই সেই জাতের সাহিত্যকে অপসাহিত্য, পণ্যসাহিত্য ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। অনেকে আবার 'শেষে বাজার রয়েছে' এমন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যকর্মগুলিকে অপসাহিত্য, পণ্যসাহিত্য, বাজারি-সাহিত্য বলে থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক অপসাহিত্য, পণ্যসাহিত্য বা বাজারি সাহিত্যের কোনও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা তাঁদের কাছে থাকে না। অথচ এই জাতের সাহিত্যগুলির একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ করা একান্তভাবেই জরুরি, নইলে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাবে।

এই প্রসঙ্গে অশ্বত্থামার দুগ্ধপানের ঘটনাটিকে স্মরণ করা যেতে পারে। কৌরব-পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের ছেলে অশ্বত্থামা, অস্ত্রশিক্ষা শেষে পাণ্ডব-কৌরবদের রোজ দুধ খেতে বায়না ধরলেন, তিনিও দুধ খাবেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষক হলেও আজকের শিক্ষকদের মতো অর্থশালী ছিলেন না। ফলে, ছেলেকে দুধ খাওয়ানোর মতো সঙ্গতি তাঁর ছিল না। কিন্তু বালক অশ্বত্থামা তা মেনে নিতে নারাজ। তিনি দুধের জন্য বায়না জারি রাখলেন। শেষ অবধি বাধ্য হয়ে দ্রোণাচার্য ছেলেকে দুধের বদলে পিটুলিগোলা পান করতে দিলেন। অশ্বত্থামা তো জীবনে কোনওদিন দুধই খাননি, ফলে দুধ ও পিটুলিগোলা জলের মধ্যে ফারাকটা জানা না থাকায় তিনি পিটুলিগোলাকেই দুধ ভেবে মনের আনন্দে পান করলেন। দিনের পর দিন দুধের বদলে পিটুলিগোলা পান করতে থাকায় তাঁর পেটে কতখানি চড়া পড়েছিল, তা অবশ্য মহাভারতের রচয়িতা স্পষ্ট করে কিছু লিখে যাননি। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, কোনটা খাঁটি দুধ, কোনটা জলমেশানো দুধ, আর, কোনটা পিটুলিগোলা, এ ব্যাপারে সম্যক ধারণাটি না থাকলে, পাঠক হয়তো বা সারাটি জীবন পিটুলিগোলা জলকে দুগ্ধজ্ঞানে পান করে মানসিক স্বাস্থ্যটিকে ক্ষয় করতে করতে থাকবেন।

তাহলে, আসল সাহিত্যের কল্যাণকর ক্ষমতাটিকে মানুষের মধ্যে চারিয়ে দেবার জন্য এবং পাশাপাশি ভেজাল সাহিত্যের ক্ষতিকর প্রভাবের থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হলে, এই দুই ধরণের সাহিত্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাঠকবর্গকে দেওয়া উচিত। সেই চেষ্টাই বরং করা যাক। প্রথমেই সৎসাহিত্যের একটা সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করা যাক। সৎসাহিত্য মানুষের জীবনে কেমন করে তার কল্যাণময় প্রভাব ফেলে, সেটাও স্পষ্ট করা যাক।

এটা তো ঠিক যে, আমরা এককালে আকারে, অবয়বে, আচরণে, চরিত্রে পশুদের খুব কাছাকাছি ছিলাম। আমাদের পূর্বপুরুষরা বর্তমান রূপটি পরিগ্রহ করবার আগে একজাতের বানরেরই জ্ঞাতিভাই গোছের ছিলেন। তারপর, বিবর্তন-তত্ত্বের নিয়ম অনুসারে, তাদের শরীরের আকার-আকৃতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এল। বিবর্তনের কারণেই, মস্তিষ্কে বুদ্ধির পরিমাণ বেড়ে যাবার দরুণ মানুষের মনোজগতেও অনেক নতুন নতুন পরিবর্তন ঘটতে লাগল। সে ভাবতে পারল। ভাবনাগুলোকে সংহত করতে পারল। তার মধ্যে অনেক জাতের ভাব, বোধ, অনুভূতি, উপলব্ধির সৃষ্টি হতে লাগল যেগুলো পশুদের মধ্যে সাধারণত থাকে না। চিন্তার সূত্র ধরে তার মধ্যে তৈরি হতে লাগল আবেগ। সে কল্পনা করবার ক্ষমতা অর্জন করল। তার মধ্যে তৈরি হল সৌন্দর্যবোধ। সুন্দর ফুলটি দেখে সে মুগ্ধ হল, তার সৌরভের ঘ্রাণ নিয়ে আকৃষ্ট হল, ধীরে ধীরে, নিজের চারপাশের রূপময় জগতটি তার চোখের সুমুখে মূর্ত হল, মনের তারে ঝংকার তুলল। এইভাবে ধীরে ধীরে তার মনোজগতটি গড়ে উঠল। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এইসব আবেগ, কল্পনা, সৌন্দর্যবোধ এবং মনের মধ্যেকার যাবতীয় অনুভূতি, উপলব্ধিগুলি হয়তো বা ছিল খুবই শাদামাটা আকাঁড়া। কিন্তু কালক্রমে সেগুলি আরও সূক্ষ্ম, মার্জিত, গভীর ও জটিল হতে লাগল। সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে দিগন্তস্পর্শী সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ দেখতে দেখতে তার মনে তৈরি হল অপার বিস্ময়ের অনুভূতিসহ নানান জাতের কল্পনা, কিংবা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অসীম রূপটিকে দেখতে দেখতে তার মনের মধ্যে চলতে লাগল এক অচেনা অনুরণন। কিংবা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে তৈরি হল সুস্পষ্ট বিভীষিকাবোধ। ঐসব নিয়ে তার মধ্যে তৈরি হল নানা জাতের আবেগ, কল্পনা ও উপলব্ধি। সেই আবেগ, কল্পনা ও উপলব্ধিগুলো কালক্রমে আরু গভীর হতে লাগল। সে ঐ আবেগ ও অনুভূতিগুলিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে চাইল। কিন্তু তখনও অবধি মনের সেই সূক্ষ্ম, গভীর, জটিল ভাবগুলিকে প্রকাশ করবার মতো ভাষা সে তৈরি করতে পারেনি। কেবলমাত্র মনের শাদামাটা কিছু ভাবকে প্রকাশ করবার মতো কিছু শব্দ ও বাক্য গড়ে তুলতে পেরেছে। কাজেই, মনের মধ্যে ভাব যত জমাট বাঁধতে লাগল, সেই ভাবকে প্রকাশ করবার জন্য সে উতলা হয়ে উঠল। ফলত, সেইসব ভাবকে প্রকাশ করবার উপযোগী ভাষাও মানুষ গড়ে তুলতে লাগল। তৈরি হতে লাগল অনেকনেক শব্দ, সেইসব শব্দকে ভাবপ্রকাশের অনুকূলে ব্যবহার করবার মতো

বাক্যবিধি, তাকে ত্রুটিমুক্ত করবার জন্য ব্যাকরণ, তুলনা করবার মতো উপমা…। বাগদেবীর শরীরে একটু একটু করে অলংকার চড়তে লাগল। বলাই বাহুল্য, তখনও অবধি লিপি আবিষ্কার করতে পারেনি মানুষ। লিপি এসেছে অনেক পরে। কালক্রমে আমাদের ভাবজগতটি যত সূক্ষ্ম গভীর ও জটিল হতে লাগল, ভাষাও সেই অনুসারে বিবর্তিত হল।

আসলে, আমাদের যাবতীয় ভাব ও ভাবনার প্রকাশমাধ্যমটি হল একগুচ্ছ শব্দের সম্মিলিত ক্রিয়া, যার নাম আমরা দিয়েছি, ভাষা। এই ভাষা এবং ভাবটি কালক্রমে আমাদের মানসলোকে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে, আজকে আর আমরা ভাবকে ভাষা ছাড়া ভাবতে পারি না, ভাষাকেও ভাব ছাড়া ভাবতে পারি না। এবং এই ভাব ও ভাষার যে সুষম মেলবন্ধন, সেটাই আসলে সাহিত্য। অর্থাৎ ভাব ও ভাষার মিথুনলগ্নে সাহিত্যের জন্ম। আর, পরস্পরের এমন সখা, মিত্র ও বন্ধু এই ভাব ও ভাষা, এমনই পরস্পরের পরিপূরক, তাদের একটি উন্নত হতে থাকলে অন্যটিকেও উন্নত হতে হয়। একটি নিচের দিকে নামলে অন্যটিকেও নিচের দিকে নামতে হয়। হ্যাঁ, এমনই প্যারামিটার ঠিক করা হয়েছে তার, এমনই পারদদণ্ড ঠিক করা রয়েছে, একটা উঠলে কিংবা নামলে আর একটা উঠবেই কিংবা নামবেই।

তো, যখন আমাদের আদিম সাহিত্যগুলি রচিত হয়েছিল, তখন মানুষ যে ভাবের অধিকারী ছিল, যে চিন্তাভাবনার অধিকারী ছিল, কল্পনার যে ব্যাপ্তি ও সুক্ষ্মতার অধিকারী ছিল, আজকে সেই ব্যাপ্ত, সেই সূক্ষ্মতা, সেই গভীরতা, সেই বহুগামিতা অনেকখানি বেড়ে গেছে। মানুষ আজ অনেক সূক্ষ্ম, অনেক গভীর, অনেক জটিল ভাবনা ভাবতে পারে। এবং সেই কারণে, তাকে রোজদিন আরও অনেক অনেক নতুন শব্দ উপমা, অলংকার আবিষ্কার করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। সেগুলিকে দিয়ে গাঁথা মালাটির বয়নকৌশলও আর আগের মতো শাদামাটা নেই, থাকতে পারে না।

এ পর্যন্ত পৌঁছেই প্রশ্ন জাগে, মানুষের মনোজগতে উৎপন্ন যে ভাব ও ভাবনাগুলি, সেগুলো কোন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়? মানুষ কোত্থেকে তার কাঁচামাল পায়? এর জবাবে মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা যুগে যুগে যা-সব বলে এসেছেন, তার নির্যাস হল, মানুষের প্রবৃত্তিই (তাকে কেউ বলেছেন প্রবৃত্তি, কেউ বলেছেন ইনস্টিংক্ট, কেউ বলেছেন লিবিডো…) সেই কাঁচামালের জোগানদার। মানুষের মনের অবচেতন ও অচেতন স্তরে বসতি করে প্রবৃত্তিই যাবতীয় ভাব ও ভাবনার বুদবুদগুলিকে অহরহ ভাসিয়ে দেয় মনের উপরিতলের উদ্দেশে। উপরিতলে ভেসে উঠেই সেই বুদবুদগুলি ফেটে গিয়ে সচেতন মনের সঙ্গে মিশে যায়। মানুষের ওপর-মনে, সেই অনুসারে, সচেতনভাবে ভাবনাগুলি মূর্ত হয়। বাস্তবিক, মানুষের পনেরো আনা ভাব ও ভাবনার ভ্রুণগুলি জন্মায় মূলত মনের অবচেতন ও অচেতন স্তরে। মানুষের প্রবৃত্তিই ওদের গর্ভগৃহ। সেখানেই ভাবনাগুলির সৃষ্টি ও উৎপাদন চলে। মানুষের সচেতন মন হল স্রেফ ভাবনার আঁতুড়ঘর। ভাবনার ভ্রুণগুলি মনের অবচেতন ও অচেতন স্তরে বেড়ে বেড়ে দশমাস দশদিন বাদে রক্তমাংসের সন্তানটি ঐ আঁতুড়ঘরে ভূমিষ্ঠ হয় মাত্র। তার অনেক আগেই স্থির হয়ে যায়, নির্দিষ্ট মানুষটি কী ভাববে। কীভাবে ভাববে, কীভাবে জীবনটাকে চালাবে। ফলে, মানুষে-মানুষে প্রবৃত্তির ফারাক হলে, তাদের চিন্তাভাবনার ধরণে সেটা ধরা পড়ে। প্রত্যেক মানুষের মনোজগতটি তাই গড়ে ওঠে পৃথক পৃথকভাবে। সেই মনোজগতটির চরিত্র অনুসারে মানুষের ভাব-ভাবনা, বোধ-অনুভূতি, রুচি-বিচার, আবেগ, কল্পনা, সৌন্দর্যবোধ, সবকিছু বদলে বদলে যায়। ভাষার মাধ্যমে সেইসব ভাব ও ভাবনার প্রকাশও ঘটে পৃথক পৃথক। সেই অনুসারে পৃথক পৃথক জাতের সাহিত্যও গড়ে ওঠে।

তাহলে, এ পর্যন্ত এটুকু বোঝা গেল যে, আমাদের ভেতরের যে ভাবজগৎ, সেই ভাবজগতের বোধগুলিএ যখন আমরা শব্দ ও বাক্যের মালা গেঁথে প্রকাশ করি, তখন তা হয় সাহিত্য। আর, মানুষের সেই ভাবজগতটি গড়ে তার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার প্রবৃত্তি অনুসারে। নিজস্ব ভাবনা দিয়ে একজন সাহিত্য রচনা করেন, দশজন তা পাঠ করে নিজেদের ভাবনার জগতটিকে তৈরি করে। কাজেই ভাবনাগুলি উজ্জ্বল ও সদর্থক হলে সাহিত্যও উজ্জ্বল ও সদর্থক হয়, ভাবনাগুলি মলিন হলে সাহিত্যও হয়ে যায় মলিন।

কাজেই হরেদরে রচয়িতা এবং পাঠক দু'পক্ষের ভাবজগতটিকেই প্রভাবিত করে।

তাহলেই প্রশ্ন ওঠে, আমরা ভাবনার ভাষারূপটি আঁকব কীসের প্রয়োজনে? বাস্তবিক, আমরা কীসের তাগিদে সাহিত্য তৈরি করব? কীসের তাগিদেই বা সাহিত্য পড়ব? এর জবাবে বলতে হয়, সাহিত্য আমাদের ভাবজগতটিকে কেবল প্রকাশই করবে না, তাকে আরও সমৃদ্ধ করবে, এই আশা নিয়েই সাহিত্যসৃষ্টির সূচনা ঘটেছিল নির্ঘাৎ। আমাদের সেই সুদূর পুর্বপুরুষেরা যা-সব ভাবতে পারতেন, তাতে কল্পনার সেই ব্যাপকতা, সেই সূক্ষ্মতা, সেই গভীরতা, সেই জটিলতা ছিল না। তাঁরা ফুলের গন্ধ পেয়ে একটু আনমনা হয়ে যেতেন, ফুলের রঙ দেখে একটু হয়তো মুগ্ধ হয়ে যেতেন, কিন্তু সেই রঙকে রামধনুর মতো বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে দেবার মতো তাদের ভাষা তাদের দখলে ছিল না। আমরা আজ তাদের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম, অনেক গভীর, জটিল ও ব্যাপক ভাবজগতের অধিকারী হয়েছি। সবাই না হলেও কেউ কেউ তো হয়েছেনই। তাই এখন আমরা যে সাহিত্য রচনা করব, তাতে আমাদের অনেক পরিণত ভাবজগতের প্রতিফলন ঘটবে, এবং ক্রমাগত সাহিত্যরচনা ও সাহিত্যপাঠ সেই ভাবজগতটিকে ঘসেমেজে আরও উৎকৃষ্ট, আরও উজ্জ্বল, আরও শাণিত করবে, এমনটাই প্রত্যাশিত। এখানেই সাহিত্যরচনা ও সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা।

বলাই বাহুল্য, আমরা যুগ যুগ ধরে আমাদের সেই মনোজগতটিকে উন্নত, পরিণত ও উৎকৃষ্ট করবার সাধনাই চালিয়ে যাচ্ছি। অন্ততপক্ষে, প্রত্যেক মানুষের লক্ষ হওয়া উচিত সেটাই। উন্নত, পরিণত ও উৎকৃষ্ট বলতে কী বুঝছি? সেটাই এবার আলোচনা করা যাক।

আমাদের সেই সুদূর পূর্বপুরুষদের ছিল প্রায় পশুদের মতো জীবন। আজকের পশুরা যা-যা করে, সেযুগের মানুষও হরেদরে প্রায় তাই করত। বলা হয়, আজ আমরা পশুদের থেকে অনেকখানি বদলে গিয়েছি। পশুত্বের ভিতের ওপর চলছে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন মনুষ্যত্বের সাধনা। সেই সাধনায় আমরা কতখানি সফল হলাম দেখা যাক। দেখতে পাই, পশুরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে যা-যা করে, এখনও অবধি আজকের বহু মানুষ হরেদরে তাই-তাই করে। এখনও আমরা ঘুরেফিরে অনেকখানি পশুই। পশুরা কী কী করে? খিদে পেলে খায়, ঘুম পেলে ঘুমোয়, রেগে গেলে ঝগড়া করে, ভয় পেলে পালায়, কষ্ট পেলে কাঁদে, খুশির কারণে আনন্দ প্রকাশ করে, মৈথুন ও বংশবৃদ্ধি করে, রোগব্যাধিতে ভোগে, তার জন্য নিজেদের মতো ওষুধ-বিষুধ খায়, নিজেদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় গড়ে, খাবার সংগ্রহে বেরোয়, তার জন্য জান ক্ষয় করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কোথায় কখন পর্যাপ্ত খাবার পাওয়া যাবে, কোথায় নিরাপত্তা বেশি, কোন ঋতুতে কোথায় জল জমে যাবে, তার আগে উঁচু জায়গায় উঠে যেতে হবে, সেসব তারা বোঝে। পাখিদের ক্ষেত্রে, কোন ঋতুতে পোকামাকড় পাবে। পশুদের ক্ষেত্রে, কখন ভূমিকম্প আসছে, অর্থাৎ কিনা দৌড়ে পালাতে হবে। পিঁপড়েদের ক্ষেত্রে, কখন বর্ষার মরসুম আসছে, অর্থাৎ তার আগে খাবারদাবার মজুত করে ফেলতে হবে। মৌমাছিদের ক্ষেত্রে, কখন কোন বনে ফুল ফুটবে, মধু পাওয়া যাবে, তার আগে চাকটিকে গড়ে নিতে হবে। নিজেদের বেঁচে থাকবার জন্য এইসব হাজারো জ্ঞান তারা প্রকৃতির স্কুল থেকে শিখে নেয়। সেই হিসেবে তারাও একটি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ বিশ্বের বিদ্যালয়ের আজীবন ছাত্র। তারপর একদিন তারা মরে যায়। পশুরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে হিংস্র, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব। আমরা বারোআনা মানুষও কিন্তু হরেদরে তাই। ক্ষিদে পেলে খাই, তার জন্য হরেক প্রকারের কাজকর্ম করি। আমরাও ঘুম পেলে ঘুমোই, দুঃখ পেলে কাঁদি, রেগে পেলে ঝগড়া করি, ভয় পেলে পালাই, রোগব্যাধিতে ভুগি, তার জন্য ওষুধবিষুধ খাই। আমরাও কম হিংস্র, কম নির্মম, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব, ঈর্ষাকাতর নই। আমরাও সর্বদা পশুদের মতো কেবল নিজেরটাই ভাবি। অন্যের জন্য নুন্যতমও ভাবি না। আমরাও পশুদের মতোই যৌনসংযমের মাধ্যমে বংশবিস্তার করি। আমরাও নিজেদের জীবনরক্ষা ও ভোগের জন্য জ্ঞান আহরণ করি। আমরাও একদিন মরে যাই। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এগুলো আমাদের দুই তরফের মধ্যেই রয়েছে। এগুলোকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা রিপু অর্থাৎ শত্রু বলে চিহ্নিত করেছিলেন। পশুদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে বিপুল পরিমাণে ওগুলো ছিল,

এবং আছে। পশুদের মধ্যে এখনও অসংবৃত যৌনক্রিয়া থেকে গেছে। (পশুরা যে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে যৌনক্রিয়া করে, সেটা তাদের কোনও গুণ নয়, তাদের শরীরে যৌনব্যবস্থাটিই সেইরকম। নির্দিষ্ট ঋতু না এলে তাদের মধ্যে যৌন আকাঙ্খা তৈরি হয় না।) তাহলে, ধরণটা একটু ইতরবিশেষ হলেও পশুরা যা-যা করে, আমরাও হরেদরে তাই করি। তাহলে কি মানুষ আর পশু একেবারে হুবহু এক? এই দুই তরফের মধ্যে কি কোনই ফারাক নেই? আছে বৈকি। জীবনযাপনের চৌদ্দআনা একরকম হলেও মানুষ আর পশুতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। কোথায় সেই তফাৎ? পশুদের প্রবৃত্তিগুলো মানুষের মধ্যেও রয়েছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মমতা, দয়া, পরোপকার, কল্পনা, সৌন্দর্যবোধ, যুক্তিবোধ, সংযম, নিয়ন্ত্রণ, আরও অনেককিছু উপাদান। এই উপাদানগুলোর সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের ফলে আমাদের মনের মধ্যেকার পশুপ্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত, সংযত থাকে এবং উপরোক্ত মনুষ্যসুলভ প্রবৃত্তিগুলি বিকশিত হয়। কাজেই, পশুত্বের ভিতের ওপর থেকেও মানুষ তার মানসভূমিটিকে একটু একটু করে উচ্চস্তরে নিয়ে যাবার সাধনা করে চলেছে। সেই সাধনায় যে যতটুকু সফল হচ্ছে, সে ততটুকু মানুষ। বাকিটা পশু।

তো, আগেই বলেছি, ভাবের জগতে মানুষ যে বিকাশটা ঘটাতে পেরেছে এতদিনের সাধনায়, সেই ভাবজগতের থেকে ভাবনাকে নিয়ে ভাষার মাধ্যমে সে রচনা করে তার সাহিত্য। কারণ, লোহাকে যেমন ঘসতে ঘসতে তা আরও শানিত, আরও উজ্জ্বল হয়, তেমনই আমাদের নিজেদের ভাবগুলোকে ভাষার সঙ্গে ঘসতে ঘসতে ভাবনাগুলো আরও শাণিত, আরও উজ্জ্বল হবে। আর, পশুপ্রবৃগুলোকে দূরে সরিয়ে মনুষ্যপ্রবৃত্তিগুলি বিকশিত হতে থাকলে, ভাবনার জগতটি আরও উৎকৃষ্ট, মনুষ্যসুলভ হবে। ফলে, সেই ভাবজগৎ থেকে উঠে আসা সাহিত্যগুলিও হবে মনুষ্যত্বের ছোঁয়ায় ভাস্বর। যিনি তা পড়বেন, তাঁর মধ্যেও সেই ভাবটা সংক্রামিত হবে এবং পাঠকের ভাবজগতটিও ক্রমশ সমৃদ্ধ হবে। এই কারণেই আমরা সাহিত্য রচনা করি, সাহিত্য পাঠ করি। এটা নিছক কোনও অভিনব, বিস্ময়কর কাহিনিমালার প্যাকেজ নয়, সাহিত্য হল আসলে আমাদের এতদিনের সাধনায় গড়ে তোলা সমৃদ্ধ ভাবজগতটির সঙ্গে আমাদের গড়ে তোলা ভাষাটির সার্থক মেলবন্ধন। কাজেই, আমরা সেই সাহিত্য রচনা করতে চাই, সেই সাহিত্য পড়তে চাই, যা আমাদের ভাবজগতটিকে সমৃদ্ধ করে। আমরা জানি, মানুষের সভ্যতা কতটা এগিয়েছে তা পরিমাপ করবার যতগুলো মাপকাঠি রয়েছে, তার মধ্যে একটা হল, মানুষের ভাবনার জগতটি কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে। সাহিত্যের মাধ্যমে নিজেদের ভাবনার জগতটিকে সমৃদ্ধ করলে আমরা আরও উচ্চমার্গের 'মানুষ' হব, একটু বড় মাপের 'মানুষ' হব। কাজেই, যে সাহিত্য আমাদের ভাবনার জগতটিকে সমৃদ্ধ করে, আমাদের উচ্চস্তরের 'মানুষ' হতে সাহায্য করে, মনুষ্যত্বের সাধনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত করে, আমাদের পশুত্বের থেকে দূরবর্তী করে তোলে, তাকেই বলি সৎ সাহিত্য। আর যে সাহিত্য আমাকে ক্রমশ পশুত্বের দিকে ঠেলে দেয়, পশুত্বের নিকটবর্তী করে তোলে, আমরা সেই সাহিত্যকে অপসাহিত্য বলি।

একটা সময়ে পৌছে পশুদের থেকে মানুষের আরও একটা জায়গায় একটা বড়সড় তফাৎ হয়ে গেল। মানুষ একটা বড়সড় লম্ফ মারল। সে সমাজ গড়ল। পৃথিবীর আর কোনও প্রাণী আজ অবধি সমাজ গড়তে পারেনি। এই সমাজ গড়াটাও মানুষের ভাবনার জগতে একটা বিশাল উল্লম্ফন। সমাজ গড়া মানে কি? আমরা আর একা একা থাকব না। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে থাকব, একসঙ্গে বাঁচব। এটা ঠিক যে, পশুরাও নিজ নিজ প্রজাতি মিলে একত্রে বসবাস করে। কিন্তু সেটা হল তাদের যুথবদ্ধ জীবন, সমাজবদ্ধ জীবন মোটেই নয়। যুথবদ্ধ জীবনের সঙ্গে সমাজবদ্ধ জীবনের আকাশপাতাল ফারাক। একটা এলাকায় এক হাজার বাইসন একত্রে চরে বেড়ায়। কিন্তু একটা বা দুটো বাঘ যখন তাদের একটাকে আক্রমণ করে ঘায়েল করে ফেলে, অন্য বাইসনরা সঙ্গীকে ফেলে দৌঁড়ে পালায়। বাঘদুটো যখন জখম বাইসনটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, অল্প দূরে বাকি বাইসনগুলো নির্বিকার মনে চরতে থাকে। অথচ, ঘটনাটা যদি একটু অন্যরকম হত, অর্থাৎ একহাজার বাইসন যদি বাঘদুটোকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলত, তবে তাদের সমবেত

সিংয়ের গুঁতায় বাঘবাজীর ভবলীলা তৎক্ষণাৎ সাঙ্গো হত। কিন্তু তারা সেটা করে না। একটি পশু তার শিকারলব্ধ খাদ্যটি যখন খাচ্ছে, অন্য পশুটি পাশেই অভুক্ত হয়ে রয়েছে, এই অবস্থায় প্রথম পশুটি কখনোই দ্বিতীয় পশুটিকে খাবারের ভাগ দেবে না। একটি পশু যখন কঠিন ব্যাধিতে ছটফট করছে, অন্য পশুরা নির্দ্বিধায় তাকে ফেলে অন্যত্র চলে যাবে। পশুদের দুনিয়ায় এসব আকছার ঘটে থাকে কারণ তারা যুথবদ্ধভাবে বাঁচে, সমাজবদ্ধভাবে নয়। একটা সময় ছিল, যখন মানুষও পশুদের মতোই একা একা বাস করত। একা একা ঘুরে বেড়াত, খাদ্য সংগ্রহ করত, শিকার করবার চেষ্টা করত, যদিও একটা পাথরের টুকরো নিয়ে সারাজীবন একা একা একটা হরিণের পিছু পিছু ছুটলেও হরিণটাকে মারা সম্ভব নয়। তার ওপর ছিল, সীমাহীন অরণ্য জুড়ে হিংস্র শ্বাপদের দল। ছিল বিষাক্ত সাপখোপ, পোকামাকড়। ছিল অচেনা রোগব্যাধি। ছিল ভয়াল, রুদ্র প্রকৃতির নির্দয় আক্রোশ। এতকিছুর সঙ্গে সে একা একা অভিমন্যুর মতো ব্যার্থ লড়াই চালিয়ে যেত। ফলে, সেযুগে মানুষ কাতারে কাতারে মরেছে। খিদেয়, তেষ্টায়, রোগেব্যাধিতে, হিংস্র শ্বাপদ আর রুদ্র প্রকৃতির নির্দয় আক্রমণে, সে এক অসহায় মৃত্যু। বাস্তবিক, এত-এত প্রতিকূলতার মধ্যে সেযুগের নিঃসঙ্গ মানুষ ছিল নিতান্তই অসহায় একটি জীব। কালক্রমে, আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে, মানুষ উপলব্ধি করে যে, এই নির্মম পৃথিবীতে একা একা বাঁচা যাবে না। সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে, একসঙ্গে বাঁচতে হবে, একসঙ্গে ভাবতে হবে। একসঙ্গে থাকলে কেবল লোকবলই বাড়ে না, বুদ্ধিবলও অনেকগুণ বেড়ে যায়। একসঙ্গে থাকলে খাদ্যসংগ্রহের তাগিদে কেবল যে একটা বিশাল ম্যামথকে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ করে মেরে ফেলা যায় তাই নয়, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন ভাব-ভাবনারও বিনিময় ঘটে। তাতে করে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার ঝুলিটি সমৃদ্ধ হয়। কাজেই, একা একা না বেঁচে সবাই মিলে একসঙ্গে বাঁচতে হবে। মানুষের ভাবনার জগতে সেটা ছিল এক বিপ্লববিশেষ। সেই বোধ থেকে, সেই কতকাল আগে, মানুষ সমাজ গড়েছিল। আর, সমাজ গড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অগ্রগতির গতিটা অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল। সমবেত লোকবল আর বুদ্ধিবলই তাদের একের পর এক আবিষ্কারে সহায়তা করেছে। কথায় বলে, একা না বোকা। মাত্র দুজন থাকলেই একটা ভাব বিনিময়ের বাতাবরণ তৈরি হয়ে যায়। একজন একটা আবিষ্কার করল, অন্যজন তার মধ্যেকার ত্রুটিটা ধরিয়ে দিল, অন্য দশজন সেটা ব্যবহার করে তার কার্যকারিতা বুঝিয়ে দিল...। মানুষ একসঙ্গে থাকবার ফলেই সেযুগে একের পর এক জ্ঞান আহরণ ও আবিষ্কারগুলি সম্ভব হয়েছিল। এখন তো সারা পৃথিবী জুড়ে এক-একটা আবিষ্কার সম্পূর্ণত টিমওয়ার্কের ফল। সবাই একত্রে থাকবার দরুণ মানুষ দলবদ্ধভাবে শিকার করেছে, অস্ত্রশস্ত্র বানিয়েছে, নিরাপদ আশ্রয় বানিয়েছে, ব্যবহার্য সামগ্রী বানিয়েছে। একসময় আগুণ আবিষ্কার করেছে, চাকা আবিষ্কার করেছে, চাষবাস শিখেছে, নাচগান, ছবি আঁকা, সাহিত্য, শিল্পকর্ম, সবকিছুই মানুষ শিখেছে দলবদ্ধ হয়ে থাকবার দরুণ। ধীরে ধীরে পৃথিবীতে কৃষি এসেছে, শিল্প এসেছে, সমৃদ্ধি এসেছে। সবই দলবদ্ধ প্রয়াসের ফল। এই যে মানুষের সমাজবদ্ধতা, তার সঙ্গে যুথবদ্ধ জীবন্দের তফাৎ কি? সমাজবদ্ধ জীবনের মূলমন্ত্রই হল, লিভ এণ্ড লেট লিভ। কেবল নিজের নয়, অন্যের কথাও ভাবো, কেবল নিজেকে নয়, অন্যকেও বাঁচতে সাহায্য কর। সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। পশুদের মধ্যে কিন্তু এই ভাবনাটা কখনোই আসেনি। পশুরা তাই আজও নিজেদের জন্য কোনও সমাজ গড়তে পারেনি।

তাহলে, আজ থেকে বহুকাল আগে মানুষ তার ভাবনার জগতটিকে বিকশিত করতে করতে পশুদের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্যগুলিকে স্পষ্ট করেছিল। তাই, আজ সাহিত্য রচনা করবার কালে আমাদের এই কথাটা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, যে ভাবনাকে ভাষারূপ দিয়ে আমরা সাহিত্য রচনা করছি, আমাদের সেই ভাবজগতটি যেন মনুষ্যোচিত হয়, সেই সাহিত্য পাঠ করে মানুষ যেন তার মনুষ্যত্বের সাধনায় এক কদম এগোতে পারে, সেই সাহিত্য যেন আমাদের পশুদের দিকে এক কদম পিছিয়ে না দেয়। সেই সাহিত্য পাঠ করে আমরা যেন পশুদের মতো জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ না হই।

এতক্ষণে বোধ করি সৎসাহিত্য ও অপসাহিত্যের দুটি পৃথক সংজ্ঞা আমরা পেলাম। যে সাহিত্য সংযমে, সমাজবদ্ধতায়, দয়া-মমতায়, কল্পনায়, সৌন্দর্যবোধে, যুক্তিবোধে, সমষ্টিচেতনায় আমাদের আরও বেশি মানবিক করে তোলে, সেটাই সৎসাহিত্য। আর, যে সাহিত্য আমাদের স্রেফ আহারে, মৈথুনে, ভোগে লোভে, হিংসায়, আত্মকেন্দ্রিকতায়, অসংবৃত যৌনতায় ক্রমশ পশুত্বের দিকে পিছিয়ে নিয়ে যায়, সেটাই অপসাহিত্য। এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। এককালে আমরা একেবারে পশুর মতো অসংবৃত যৌনজীবন কাটাতাম। দিনেরাতে, যখন-তখন, মাঠেঘাটে প্রকাশ্যে চলত আমাদের উদ্দাম যৌন ক্রিয়াকলাপ। আজ আমরা আমাদের যৌনজীবনকে অনেক সংযত, নিয়ন্ত্রিত করেছি, অনেক সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন করেছি। পশুরা তা আজও করেনি। আজ যদি আমরা সাহিত্যে যৌনতার এমন কদর্য নির্লজ্জ প্রদর্শনী করি, তবে ভাবনার জগতে আমরা আবার সেই পশুদের মতোই যুথবদ্ধ অথচ ব্যক্তিসর্বস্ব জীবন যাপন করি, আমরা যদি সারাটা জীবন কেবল উদ্দাম ভোগের পেছনেই ছুটতে থাকি, কেবল নিজের ভোগের জন্যই প্রাণপাত করি, যদি অন্যের দিকে তাকানোর কথা ভুলে যাই, কোনও সাহিত্য যদি আমাদের সেই পশুত্বের কুমন্ত্রে দীক্ষিত করতে চায়, সেই সাহিত্য পড়ে আমাদের মনে যদি এমন বিশ্বাস বলবৎ হয় যে, শুধু আহার, মৈথুন আর ভোগ কর, কে মরল কে বাঁচল দেখার দরকার নেই, সবাই মিলে ভোগ করা যায় না, কিছু মানুষ ভোগ করলে কিছু মানুষকে অভুক্ত থাকতেই হবে, পৃথিবীতে সবাইয়ের আকণ্ঠ ভোগ করবার মতো এত সম্পদ নেই, কাজেই, যে যত বলবান, সেই বেশি ভোগ করবে, দুর্বলরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, --- যে সাহিত্য এই দর্শনগুলিকে প্রচার করে, তা অবশ্যই অপসাহিত্য, কারণ, এই সাহিত্য পাঠ করবার পর আমাদের মনের অতলে অবদমিত পশুত্বের বোধগুলি উস্কানি পায়। ঐ সাহিত্য আমাদের ক্রমশ পশুত্বের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এবার আসি পণ্যসাহিত্যের কথায়। পণ্য হল ক্রয়বিক্রয়যোগ্য ভোগ্যসামগ্রী, যাকে পণ অর্থাৎ মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। এবং ঐ সামগ্রী মানুষ নিছক ভোগ করে। সেই হিসেবে খাদ্য, বস্ত্র ও প্রায় সমস্ত ব্যবহার্য সামগ্রীই বহুকাল যাবৎ ক্রয়বিক্রয়যোগ্য অর্থাৎ পণ্য হয়ে গেছে। শিক্ষাদান, চিকিৎসা গোছের কিছু বিষয় অনেককাল যাবৎ ঠিক সেই অর্থে ক্রয়বিক্রয়যোগ্য ছিল না। ওগুলো সেবামূলক কাজ বলেই ধরা হত। আজ সেগুলোও পণ্য। শিক্ষা, চিকিৎসাগোছের বিষয়ও আজ চড়া দামে কিনতে হয়। বরং বিশ্বায়নের ‘কল্যাণে’ সেইসব বিষয় আজ সবচেয়ে লাভজনক বাণিজ্যিক পণ্য। এই কিছুকাল আগে অবধি সাহিত্য ঠিক সেই অর্থে ক্রয়বিক্রয়যোগ্য পণ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সাহিত্য রচিত হত, প্রকাশিত হত, পাঠক কখনও বিনামূল্যে, কখনও বা কিছু দক্ষিণার বিনময়ে তা সংগ্রহ করতেন। এমনকী, যখন সাহিত্যপত্রিকাগুলি কিংবা প্রকাশিত গ্রন্থগুলি নগদ দামে কিনতে হল, তখনও অবধি সাহিত্য পণ্য হয়ে ওঠেনি। কারণ, খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রীগুলি যেমন ক্রেতার রুচি ও চাহিদার দিকে নজর দিয়ে তৈরি ও বাজারজাত করা হত, সাহিত্যের ক্ষেত্রে মোটেই তা করা হত না। সাহিত্য রচিত হত তার নিজস্ব শৈলীতে, উৎসাহী পাঠক প্রকাশিত পত্রিকা কিংবা বইটি অবশ্যই কিনে পড়তেন, কিন্তু তার জন্য লেখককে কখনোই পাঠকরুচি ও চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে লিখতে হত না। ঐ সময়কালেও যে লঘুসাহিত্য রচিত হত না, তা নয়, তবে তা বাজারে বেশি কাটবে, এমনটা ভেবে লেখা হত না। তখন লঘুসাহিত্য যাঁরা রচনা করতেন, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব লঘু জীবনদর্শনের কারণেই তা করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে দিন বদলাতে লাগল। শিক্ষা, চিকিৎসা, বীর্য, রক্তসহ দুনিয়ার সব সেবামুলক বিষয়গুলি একটু একটু করে বিক্রয়যোগ্য হয়ে উঠল। ততদিনে বিশ্বায়নের অল্পস্বল্প ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে এদেশের তটভূমিতে। দেখতে দেখতে কিছু সাহিত্যের কারবারীর উদয় ঘটল, যাঁরা সাহিত্যকে পুরোপুরি বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীতে পরিণত করে, তার থেকে মুনাফা লাভ করবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। বাজারের প্রত্যেকটি পণ্যের ক্ষেত্রে, উৎপাদনের আগে ও পরে বাজার যাচাইয়ের ব্যাপার রয়েছে, কিনা, যে সামগ্রীটি তৈরি করব, তার চাহিদা কেমন, কিংবা যে তৈরি পণ্যটিকে বাজারজাত করলাম, তা ক্রেতাদের মধ্যে সাড়া ফেলল কিনা, ক্রেতাকুল আরও কী ধরনের

পরিবর্তন ও পরিমার্জন চাইছে? সেইমতো পরবর্তী পণ্যগুলি তৈরি করা হয়। এটা সাধারণভাবে সমস্ত ধরনের পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে সবাই মানে। সাহিত্যের সেই কারবারীরাও যখন সাহিত্যকে আর পাঁচটা পণ্যের আদলে তৈরি করবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখনই প্রশ্ন উঠল বাজার যাচাইয়ের। কিনা, বেশির ভাগ পাঠকের কাছে কী ধরনের সাহিত্যের চাহিদা বেশি। তাঁরা তাঁদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও পাঠকদের মেজাজ-মর্জি যাচাই করে বুঝলেন, অধিকাংশ মানুষই তাদের অন্তর্গত পশুপ্রবৃত্তিগুলোকে প্রচ্ছন্নভাবে লালন করতে ভালোবাসেন। যতই না শিক্ষা-সংস্কৃতির মোড়কে ঢাকা থাক তাঁদের আধুনিক 'সভ্য' জীবন, আপাত মনুষ্যত্বের আড়ালে চাপা থাকা তাদের পশুপ্রবৃত্তিগুলি তো মরেইনি, বরং নিজেদের অজান্তে 'গোকুলে বেড়েছে'। কাজেই, সাহিত্যে মানুষের পশুপ্রবৃত্তিগুলিতে আলতো সুড়সুড়ি দেবার কাজটি শুরু হল। সাহিত্য হল মানুষের আদিম বিনোদনের একটি উপাদান। সেই সাহিত্যে একদিকে যেমন উদ্দাম যৌনতার ছড়াছড়ি, অন্যদিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোগবিলাস, মর্ষকাম, ধর্ষকাম জাতীয় বিকৃতিগুলিও ঢালাওভাবে ঠাঁই পেতে লাগল। মানুষের ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের উচ্চাকাঙ্খা, সমাজবিচ্ছিন্নতা, অপরাধপ্রবণতা, আত্মসর্বস্বতাভিত্তিক লঘুরচনাগুলির কদর গেল বেড়ে। সেই সব রচনা চুটিয়ে বাণিজ্য করতে লাগল। জন্ম নিল একেবারে বাণিজ্যভিত্তিক পণ্যসাহিত্য। সেই সাহিত্যের কারবারীরা অন্য পণ্যব্যবসায়ীদের মতোই নিয়মিত বাজার-নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝে নিতে চাইলেন, সাধারণ পাঠকের কাছে কোন ধরনের রচনার কাটতি বেশি। তাঁরা নির্বাচিত লেখকদের দিয়ে সেই জাতের গল্প-উপন্যাস-কবিতাগুলি লেখাতে লাগলেন। সেই বাবদ তাঁদের আকর্ষণীয় পারিশ্রমিক দিলেন, ঝলমলে বিজ্ঞাপন দিলেন, আকর্ষণীয় অর্থমূল্যে কেনা কিছু পেটোয়া 'পণ্ডিত'দের দিয়ে সর্বদা ওইসব লেখকদের জয়গান করাতে লাগলেন, এবং আরও কিছু প্রচারমূলক ব্যবস্থা নিলেন, যাতে করে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য হল যে, ওগুলোই 'অসলি' সাহিত্য। ফলে, সেইসব লেখকরা রাতারাতি যশখ্যাতির তুঙ্গে উঠে গেলেন। বর্তমানে এই প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি বাণিজ্যভিত্তিক। এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত রচনাগুলি একেবারে বাজারি পণ্যের আদলে তৈরি হয়, বিকোয় এবং মুনাফা টেনে আনে। যদি বাজার-নিরীক্ষায় ধরা পড়ে যে, কোনও লেখকের ফরমায়েশি রচনাটি যথেষ্ট পরিমাণে ক্রেতা অর্থাৎ পাঠক টানতে পারছে না, তবে ঐ সাহিত্যের কারবারীরা তৎক্ষণাৎ ঐ লেখকটিকে তাঁদের তালিকা থেকে ছেঁটে দিয়ে ঐ জায়গায় অন্য লেখককে নিযুক্ত করেন।

বাংলা সাহিত্যের এখন সেই পণ্যসাহিত্যেরই রমরমা। ঐ জাতের রচনায় সাধারণ পাঠক তাঁদের অবদমিত বাসনাপূরণের উপাদানগুলি ঠিকঠাক পেয়ে যান। আর, যেহেতু পশুজীবনের স্মৃতিবাহিত মানুষের কাছে এখনও অবধি যৌনতাই প্রধান অন্তঃসলিলা বাসনা, পণ্যসাহিত্যে যৌনতার ছড়াছড়ি একেবারে অনিবার্য। বাণিজ্যগোষ্ঠীর তালিকাভুক্ত লেখকেরা যদি তাঁদের রচনায় যৌনতা কিঞ্চিৎ কমিয়ে আনেন, তবে ঐ সাহিত্যের কারবারীদের প্রচ্ছন্ন নির্দেশে তৎক্ষণাৎ তাঁদের পেটোয়া 'পণ্ডিত'রা সোরগোল তোলেন, কিনা, বাংলা সাহিত্য এমন নিরক্ত, ফ্যাকাসে কেন? কেন তাতে পৌরুষের এত অভাব? যৌনতার মতো জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান বাংলা সাহিত্যে কমে যাচ্ছে কেন? বলাই বাহুল্য, এই ধরণের ভোক্যাল টনিকে সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়। বেতনভুক লেখকেরা নিজেদেরকে বাণিজ্যিক হাউসের তালিকাভুক্ত রাখতে একেবারে আদাজল খেয়ে পৌরুষের জোগান দিতে থাকে। তাঁদের আরও উৎসাহিত করবার জন্য নামিদামি পূর্বসূরিদের দিয়ে ঐসব রচনার জয়গাথা প্রকাশ করা হয়, কিনা, কব্জির জোর না থাকলে এমন সাহসী সাহিত্য রচনা করা যায় না। এতে করে ঐসব লেখকেরা বেশ খানিকটা উদ্দীপিত বোধ করেন। সাধারণ পাঠকও নির্ভেজাল পিটুলিগোলা জলটিকে খাঁটি দুগ্ধজ্ঞানে পরম সম্ভ্রমে পান করতে থাকেন। মোদ্দা কথাটা হল, এই সময়ের পণ্যসাহিত্যগুলি সবদিক থেকে একেবারে বাণিজ্যিক নিয়মে তৈরি হচ্ছে এবং বিকোচ্ছে। তার বিষময় ফল ফলছে সৎ সাহিত্যের অঙ্গনে। এই ধরনের পণ্যসাহিত্যের প্রবল চাপে অভিজিৎ সেনের রহু চণ্ডালের হাড়, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর চতুষ্পাঠী, অমর মিত্রের ধ্রুবপুত্র,

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সহিস, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নদী-মাটি-অরণ্য, অনিল ঘোড়াইয়ের মুকুলের গন্ধ, সৈকত রক্ষিতের মাড়াইকল, কিন্নর রায়ের মৃত্যুকুসুম, দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, অমলেন্দু চক্রবর্তীর রাধিকাসুন্দরী, সোহরাব হোসেনের সরম আলির ভুবন, নলিনী বেরার শবরচরিত গোছের ধ্রুপদী সৃষ্টিগুলি অনাদরে ধুলোয় লুটোচ্ছে। একশ্রেণীর সমঝদার পাঠক এখনও অবধি না থাকলে, ঐসব রচনা কবেই হারিয়ে যেত।

বাংলাসাহিত্যের এ এক দুর্যোগের দিন। বড় দুঃসময় এটা। একদিকে বাজারি পণ্যসাহিত্য পাঠ করে মানুষের মনোজগতটি একটু একটু করে বিকৃত হচ্ছে, মানুষ আবার ফিরে পাচ্ছে তাদের ফেলে আসা পশুত্বের স্মৃতি। পশুপ্রবৃত্তিগুলি ক্রমাগত উস্কানি পাচ্ছে। ফলে, পণ্যসাহিত্যগুলি বাজারে রমরম করে চলছে। বছর বছর তাদের একাধিক সংস্করণ হচ্ছে। অন্যদিকে ধ্রুপদী সাহিত্যগুলি অনাদরে মলিন হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে? ওয়াকিবহাল মহলের আশঙ্কা, বিশ্বায়নের ঝড়ো হাওয়ায় এই প্রবণতা আরও বাড়বে। মানুষ যত ভোগের লালসায় দৌড়বে, ততই লঘুভাবনা তাদের গ্রাস করবে তিলেতিলে। ফলে, এই যৌনাশ্রয়ী, প্রবৃত্তিউদ্দীপক রচনাগুলির চাহিদা আরও বাড়বে। আর, তার ফলে, মানুষের এতকালের তিলতিল মনুষ্যত্বের সাধনাগুলিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গা দখল করে নেবে সেইসব পশুসুলভ উপাদানগুলি, যেগুলি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মানুষ সেই কতকাল ধরে নিরবিচ্ছিন্ন লড়াই চালিয়ে এসেছে। এখনই মানুষ স্পষ্টতই পেছোতে শুরু করেছে। তারা সবাই মুক্তকচ্ছ হয়ে ভোগবিলাসের পেছনে ছুটছে। সমাজচেতনা লুপ্ত হতে বসেছে। সেই জায়গায় আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা একেবারে জাঁগিয়ে বলছে। মানুষ আর গভীর কিছু ভাবতে চায় না, পারে না। লঘুবিনোদন, লঘুযাপনকে একেবারে আষ্টপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে চাইছে আজকের ‘বিশ্বায়িত’ মানুষ। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে এমন-সব বিচ্যুতি, বিকৃতি, যা তাদের অনিবার্যভাবে টেনে নিয়ে যাবে পেছনের দিকে। সেই সর্বনাশা যজ্ঞে অন্যদের সঙ্গে পণ্যসাহিত্যও রয়েছে।